গুরু নানক অনুধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৮) ভারতবর্ষের চিহ্নিত ধর্মগুরু। তাঁর জীবৎকালে ভারতবর্ষে চলছে প্রথমে পাঠান ও পরে মোগল রাজত্ব। সেদিন উত্তরভারতকে ধর্মান্তরীকরণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই। তিনি ধর্মে হিন্দু হলেও ভিন্ন ধর্মের প্রতি ছিলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উনিশ শতকে। তখন এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত প্রবৃত্তি। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আগত নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গ তিনি করেছেন পরম উৎসাহে। কালীবাড়ির কাছে অবস্থিত বারুদখানায় কর্মরত শিখ সেপাইদের সঙ্গেও তাঁর ছিল অবাধ মেলামেশা। তাদের কাছ থেকে তিনি গুরু নানকের নানা কাহিনি ও উপদেশ শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্মাদর্শের প্রতি তিনি আগ্রহান্বিত হন এবং শিখধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

গুরু নানকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাচরণের বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। গুরু নানকের জীবনী থেকে জানা যায়, শৈশবে অধিকাংশ সময়ই ধর্মপ্রাণ নানক গ্রামসংলগ্ন বনে আপনমনে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। বনে বহু সাধু তপস্যা করতেন। নানক সুযোগ পেলেই তাঁদের কাছে গিয়ে বসতেন, তাঁদের সেবা করতেন এবং ধর্মোপদেশ শুনতেন। এইভাবে শৈশবেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ধর্মমতগুলির মোটামুটি পরিচয় লাভ করেন। ক্রমে তিনি ধীরে ধীরে ধ্যানের রহস্য জানতে পারলেন এবং প্রায়ই নির্জনে বসে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এমন ঘটনা দেখা যায় : ''লাহাবাবুদের বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল।... বালক গদাধর এই সব সাধুর সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহারা যখন পুস্তক, পুঁথি বা পুরাণাদি পাঠ করিতেন, তখন তিনি নিবিষ্ট মনে ঐ সকল শ্রবণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামে কোথাও পুরাণ-ভাগবত-সম্বন্ধীয় কথকতা, পাঠ বা গান হইলে সে স্থানে প্রায়ই ঠাকুর হাজির থাকিতেন এবং নিবিষ্ট মনে কথা শ্রবণ করিতেন;... এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের ভিতরকার মোটামুটি আখ্যানভাগ বাল্যকালেই তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন।... ঠাকুর গদাধর এইরূপে সাধুসঙ্গের ফলে অতি অল্পবয়স হইতেই ধ্যান করিতে শিক্ষা

করিয়াছিলেন।”[১]

ব্রাহ্মণের বর্ণচিহ্ন উপবীত ধারণ করেননি নানক। উপনয়নকালে তিনি বলেছিলেন, ‘‘দয়ার তুলো দিয়ে, সন্তোষের কেটে, সংযমের গিঁট দিয়ে আর সত্যের পাক দিয়ে যে উপবীত হবে—অন্তরাত্মার পক্ষে সেই হবে সত্যকার উপবীত।”[২] শ্রীরামকৃষ্ণও সাধনকালে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। শৈশবে উপবীত ধারণ করলেও তার চেয়ে সত্যপালনকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। বালক গদাধর শূদ্রবংশীয় ধনি কামারনিকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর অভিভাবককুল সেই প্রস্তাব বাতিল করার পরিকল্পনা করলে,

‘‘হেথায় গদাই কন ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন না লব ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥”[৩]

অবশেষে গদাইয়ের জেদের কাছে বড়রা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন।

যৌবনে সাধনকালে গুরু নানক গভীর ধ্যানস্থ থাকতেন। ঈশ্বরের বিরহে তাঁর চোখে ঝরত অশ্রুধারা। তাঁর এই আচরণের জন্য অভিভাবকগণ বৈদ্যের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা করান। কিন্তু সে-বিরহের লাঘব ঘটেনি। ‘উন্মাদ’ বিশেষণও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। পরিশেষে নানক ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছিলেন : ‘‘নানক, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি, তুমি আমার আশীর্বাদ লাভ করেছ। ভালবেসে যে তোমাকে স্মরণ করবে, সেও আমার আশিস লাভের অধিকারী হবে।”[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও অনুরূপ ব্যাপার দেখতে পাই। গভীর ধ্যানে তিনি প্রায়শই নিমগ্ন হতেন। সাধনকালে ঈশ্বরবিরহজনিত অস্বাভাবিকতার জন্য তাঁকেও চিকিৎসকের (গঙ্গাপ্রসাদ সেন) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকেও সাধারণ মানুষ ‘পাগল’ ভাবত। দীর্ঘকাল সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার দর্শন লাভ করেন। তাঁর বহু দিব্য দর্শনের কথা জানা যায় যেগুলি থেকে প্রতীত হয় যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর দেহে অবস্থান করতেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, ‘‘সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত... যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।”[৫]

গুরু নানক : অঙ্কিত চিত্র

গুরু নানক জাতিভেদ মানতেন না। ধর্মপ্রচারকালে তিনি তাঁর ভক্ত অস্পৃশ্য লালোর গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও রসিক মেথর প্রমুখ বহু অস্পৃশ্য ভক্তকে কৃপা করার কথা জানা যায়। সেখ সজ্জন নামে এক কুখ্যাত দস্যু নানকের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং লুণ্ঠিত অর্থ দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে কুখ্যাত দস্যু তারা কাঁড়ার[৬]ও দস্যুবৃত্তি ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে মিশেছিল। নর্তকী নূরশাহ যেমন নানকের ব্রতভঙ্গে

ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনি সুন্দরী লছমীবাইও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে ব্যর্থ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে নতুন জীবন শুরু করেন তিনি। পরবর্তী কালে তিনি জনৈক বৈষ্ণবগুরু কর্তৃক রাধারানি দেবী নামে পরিচিত হন এবং হরিনাম সংকীর্তনে জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানকপন্থী-সাধুসঙ্গ

গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্তক। তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসীরা নানকপন্থী সাধু নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের আমলে দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তরা আসতেন এবং তাঁরা কিছুদিন সেখানে অবস্থানও করতেন। কথামৃতের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কমপক্ষে চারবার (১৮৬৮, ১৮৮২, ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে) শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নানকপন্থী সাধুদের যোগাযোগ ঘটেছে। ১৮৬৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ রানি রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়ে এক নানকপন্থী সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বয়স আঠাশ-ঊনত্রিশ। বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানেন। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। সাধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলতেন 'প্রেমী সাধু'। একদিন তাঁদের মঠে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যান। নানকপন্থী সাধু গীতা পাঠ করেছিলেন। তা এমনই আঁট যে বিষয়ী মানুষের দিকে তাকিয়ে পড়বেন না। মথুরবাবুর দিকে পিছন ফিরে পড়তে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে মুখ করে বসলেন। পাঠ সমাপ্ত করে সাধু বললেন, ''জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।'' কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সংসারীদের পরিত্রাণের উপায়। উত্তরে নানকপন্থী সাধু বলেছিলেন, ''কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।'' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের খুব পছন্দ হয়েছিল।[৭]

কথামৃতে ১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনবার নানকপন্থী সাধুদের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রসঙ্গ আছে। তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ শিখ ধর্মাদর্শের বহু প্রসঙ্গ শোনার অবকাশ পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন স্বামী প্রভানন্দ : ''দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সময়ে আসতেন অনেক নানকপন্থী সাধু। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন, 'নমো নারায়ণায়' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন, শিখধর্ম সম্বন্ধে বলতেন। তাঁদের কাছে শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিখদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'শিখরা শিক্ষা দেয় 'তু সচ্চিদানন্দ'। শিখদের মতে অশ্বত্থগাছের যে পাতা নড়ছে তাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতারও নড়বার জো নাই।' তিনি আরও বলতেন : 'শিখরা বলে, জমি, জরু আর টাকা—এ-তিনটির জন্যই যত গোলমাল।' ভক্ত শিখ সেপাইরা শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাত গুরু নানকের সুন্দর সুন্দর কাহিনী। সেইসব কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সব ব্যাখ্যা করতেন সেপাইদের তা মনে ধরত। ঠাকুরের সে-সব কথা তাদের হৃদয় স্পর্শ করত। গুরু নানকের একটি কাহিনী তিনি প্রায়ই বলতেন। তিনি বলতেন : নানকের গল্পে আছে—অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম সে-সব রক্তমাখা হয়ে রয়েছে। সাধুদের শুদ্ধ জিনিস দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নেই। সত্যপথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মিষ্ট কথাবার্তা শুনে তাঁর উপর তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু নানকের অবতার বলে মনে করতে থাকে।''[৮]

বস্তুত নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিখদের দশগুরু সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান

লাভ করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার এ-তথ্য দিয়েছেন : ''শিখদের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।' ''[৯]

শিখ সৈন্য ও গৃহস্থদের সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে দমদম, চানক ও দক্ষিণেশ্বরের শিখ সেপাইদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায়। শশিভূষণ সামন্তের এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে সেকালে বহু শিখভক্তের আগমন হত দক্ষিণেশ্বরে। চানক, দমদম ও কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকেও পাঞ্জাবি পুরুষ ও মহিলারা কালীবাড়িতে এসে পরমহংসদেবকে দর্শন ও প্রণাম জানিয়ে তাঁর উপদেশ শুনতেন। শশিভূষণ ঘোষ জানিয়েছেন : ''বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সময় তিনি নানকপন্থী শিখ সম্প্রদায়েরও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাড়ির পার্শ্বেই গভর্ণমেন্টের বারুদখানা। একদল শিখ সৈন্য রক্ষীরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইহারা সকলেই নানকপন্থী; কালীবাড়িতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিত। তিনিও বারুদখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের পরিশুদ্ধ শয্যায় বসাইয়া নিজেরা ভূতলে বসিত এবং স্বহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। কোয়ার সিং একদিন বলিয়াছিলেন,—'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই—তুমি নানক!' তিনি বলিতেন, 'কালীঘরের সামনে শিখ্‌রা বলেছিল, —ঈশ্বর দয়াময়। আমি বল্লাম,—দয়া কাদের উপর? শিখরা বল্লে—কেন মহারাজ! আমাদের সকলেরই উপর। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এতো জিনিস তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা কচ্চেন। আমি বল্লাম—তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখ্‌ছেন,—তা এতে কি বাহাদুরী? আমরা সকলে তাঁর ছেলে, ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখ্‌ছেন—তা তিনি দেখ্‌বেন না তো বামুন পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে? তবে কি তাঁকে দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা ততক্ষণ তাঁকে সবই বলতে হয়। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খুব দূরের লোক—পরের ছেলে।'

''একসময় কোয়ার সিং—তখন তাঁহার সৈন্যদল বারাকপুরে থাকিত—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি অবস্থাই গেছে! কোয়ার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখ্‌লাম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বস্‌লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে। যাই জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বস্‌তে গেলাম। ভাবলাম অত খবরে কাজ কি! তারপর যেই সকল্‌কে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বল্‌তে বল্‌তে আমি আগে খেতে লাগ্‌লাম। সাধুরা কেউ কেউ বল্‌তে লাগ্‌লো শুন্‌তে পেলাম—আরে, এ কেয়ারে! চানকের পল্টনের ভিতর ইংরেজকে আস্‌তে দেখে সেপাইরা সেলাম কল্লে। কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজত্ব তাই ইংরেজকে সেলাম কর্তে হয়।'

''এই সৈন্যদল কলিকাতার কেল্লায় একদিন বদ্‌লি হইয়া যাইতেছিল। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে গাড়িতে লইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার পথে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়। সৈনিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও সৈন্যদল 'শ্রীগুরুর জয়!' উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া একে একে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল।''[১০]

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে এ-ঘটনার উল্লেখ আছে, শিখ সৈন্যরা সেনাপতির বিনা অনুমতিতে বন্দুক রেখে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রণিপাত করলে পরে তিনি সৈন্যদের সামরিক রীতি ভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। উত্তরে শিখ সৈন্যগণ বলে,

''আমাদের এই রীতি গুরু-দরশনে॥
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক্ যাক্ প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম॥''[১১]

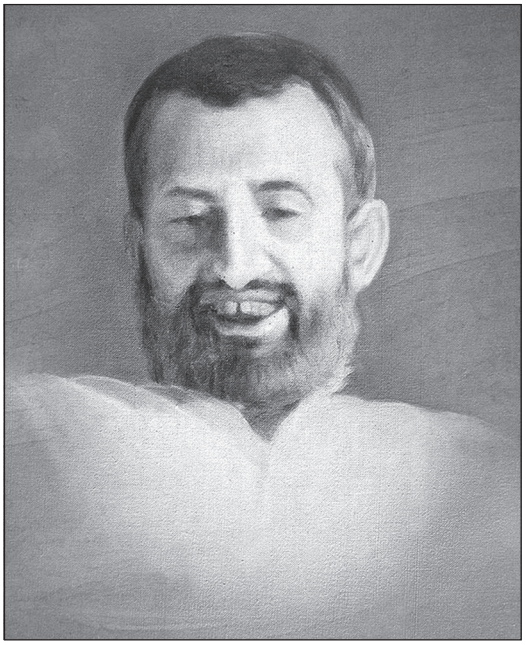

গুরুদাস বর্মন তাঁর গ্রন্থে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনাটি দক্ষিণেশ্বরে সেপাইদের ব্যারাকে। মাঝে মাঝেই শিখ সেপাইরা তাঁকে নিয়ে যেতেন বারুদখানায়। সে-যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। রাজস্থানের জয়পুরের মানুষ তিনি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সেপাইরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। তাঁর জন্য বিশেষ আসন এনে তাঁকে বসায় এবং তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে শাস্ত্রকথা শ্রবণ। তারা তন্ময় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনছে, এমন সময় নারায়ণ শাস্ত্রী ঠাকুরের কথায় কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণবাচক কথা বলতে চাইছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মাঝে তিনি কথা বলায় শিখরা বিরক্ত হয়। তাতেও নারায়ণ শাস্ত্রী যখন সংযত হলেন না, তখন শিখ সেপাইরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, ''ও কেয়া গৃহী হোকে জ্ঞান বতাতা!'' কৃপাণ হাতে ছুটে আসে তারা। এ-ঘটনায় শঙ্কিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গুণমুগ্ধ শিখ সেপাইদের শান্ত করেন। দ্বিতীয় ঘটনার স্থান ব্যারাকপুর। অন্য দিনের ঘটনা। শিখ সেপাইরা তাঁকে ব্যারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা প্রশ্ন করে : সংসারে কীভাবে থাকতে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''(ছুতারের) মেয়েরা যেমন ঢেঁকির গর্তে হাত দিয়ে চিঁড়ে পালটে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে ছেলেকে মাই দেয়, আবার হয়তো একটি খদ্দেরের সঙ্গে দর হিসেব করে, এতগুলো কাজ একসঙ্গে করে, কিন্তু মনটা তার থাকে সেই ঢেঁকির দিকে; তাই ঢেঁকিটা হাতের উপর পড়ে না। সেইরকম সংসারে থেকে ষোলআনা মনটি ভগবানে দিয়ে রাখতে হয়; তাহলে আর কোনও গোল থাকে না।''[১২]

আর একটি ঘটনা উপস্থিত করা যায় স্বামী প্রভানন্দজীর বিবরণ থেকে : শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন ব্যারাকপুরে তাঁর বন্ধু রাম মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ শিখ সেপাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ''স্নানের সময় হলো। সেপাইরা দল বেঁধে ঠাকুরকে নিয়ে চলে গঙ্গার দিকে, ঠাকুরের সাথে একসঙ্গে

স্নান করবে সবাই। সম্ভবত রাসমণি ঘাটেই ঠাকুর স্নান করেছিলেন। স্নানের ঘাটে এসে সেপাইদের মধ্যে কেউ ধরে ঠাকুরের চটিজুতো, কেউ ধরে ছাতা, কেউ ধরে কাপড়। স্নানের ঘাটে ঠাকুরকে নিয়ে তাদের আনন্দের সীমা নেই। হৃদয় ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দেন। ঠাকুর গঙ্গায় স্নান করেন। সেপাইরা ঠাকুরের জন্য কিনে আনে একটাকা একআনার জিলিপি। সাধ্যমত দেবতাকে তাদের ভোগ নিবেদন। স্নান সেরে ঠাকুর সেই জিলিপি থেকে নিজে একটু গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে বাকিটা সৈন্যরা ভাগ করে প্রসাদ গ্রহণ করে।"[১৩]

গুরু নানক ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অনুষঙ্গ :

প্রধান আটটি বিষয়ে গুরু নানক ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

ঈশ্বরের রূপ : নানক বলেছেন,

''আদি সচ যুগাদি সচ
হ্যায় ভি সচ, নানক হোসি ভি সচ।"

—সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে সত্য ছিলেন, যুগের আদিতেও সত্য ছিলেন, বর্তমানেও সত্য রূপে বিরাজিত এবং ভবিষ্যতেও বিরাজ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠেও একই অভিব্যক্তি : ''...সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিনকালেই আছেন—আদি অন্তরহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়,—তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।"[১৪]

এই বিষয়ে নানক পুনরায় বলেন,

''কেতিয়া দূখ ভূখ যদমার।
এই ভি দাতে তেরি দাতার॥
বন্দ্ খলাসী ভানে হোয়।
হোর আখ না সকে কোয়॥"

—পরমেশ্বর ইচ্ছাময়, লীলাচঞ্চল। তিনি একাধারে দাতা এবং হরণকর্তা। তাঁর ইচ্ছায় যেমন ভক্ত লাভ করে পরম ইষ্টকে, তেমনই তাঁর ইচ্ছায় জীবন হয় ঈশ্বরবিমুখ; তিনি যেমন সকল জীবের পালনকর্তা, তেমনই আবার তাঁরই ইচ্ছায় কত জীব ক্ষুধায় কাতর ও মৃতপ্রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণও একই সুরে বলেছেন, ''ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।"[১৫] ঈশ্বরই ''ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন।"[১৬] তাঁর কৃপা হলেই ''অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ।"[১৭]

সত্য : নানক বলেছেন,

''যে জন যাচে যিন সচ পছানেয়া।
আপ মার সহজ নাম সমানেয়া॥"

—যাঁরা সৎকে জেনেছেন, তাঁদের জীবনই সত্য; কারণ তাঁরা স্বীয় অহংসত্তাকে বিনষ্ট করে সত্যনামের মধ্যে নিজেদের লীন করে দিতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রত্যয়কেই ঘুরিয়ে বলেছেন, ''মনের লয় হওয়া চাই, আবার... অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।"[১৮]

নানক আরও বলেন,

''সচ সিমরিয়ে হোরে পরগাশ।
তাতে বিখিয়া মহে রহে উদাস।"

—সেই সত্যস্বরূপকে স্মরণ করলে মনের সকল তমসা ভেদ করে আলোকের আবির্ভাব হয় এবং বিষয়সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্য আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই সকল বিষয়।... বিষয়বুদ্ধি থাকতে 'সোঽহম্' হয় না।"[১৯]

নামমহিমা : নানক বলেন,

''নানক ভগতা সদা বিগাস।
সুনিয়্যা দুখ-বাপ কা নাশ॥''

—যাঁরা ভক্ত তাঁরা নিয়ত প্রভুর নামরূপ আনন্দসাগরে ডুবে থেকে স্বীয় অন্তরাত্মাকে বিকশিত করে তোলেন। নামশ্রবণে দুঃখ ও পাপের বিনাশ হয়ে অন্তরাত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।''[২০] ''হরিভক্তি হইলে আর জাতি বিচার থাকে না।''[২১]

নানক বলেছেন,

''যিন্নি নাম ধেয়ায়া গয়ে মুসক্কত ঘাল।
নানক তে মুখ উজলে কেতি ছুটি নাল॥''

—যাঁরা বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রভুর সত্যনাম বিস্মৃত হন না, অন্তিমে তাঁদের মুখোজ্জ্বল হয় এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে আরও বহু জীব সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেলকি লাগিয়ে দেয়।... হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে!... গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বরলাভ হলে সব পাশ চলে যায়।'' ''জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নামসংকীর্তন''—সংসারীদের মুক্তিলাভের পথ, বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[২২]

গুরু : নানক বলেছেন,

''সো গুরু করও জে সাচ দৃঢ়াবে।
অকথ কথাবে, শব্দ মিলাবে॥''

—গুরুপদে বরণ করবে তাঁকেই যিনি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের রূপকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করতে এবং তাঁর নাম তোমার হৃদয়ে প্রোথিত করে দিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'গুরু' প্রসঙ্গে বলেন, ''যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে।... তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।''[২৩]

নানক আরও বলতেন,

''সতগুরু মিলেয়া সচ পায়া।
জিনহী বচহ আপ গবায়া॥''

—সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হলেই সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠেও একই প্রত্যয় : ''সৎগুরুর কাছে উপদেশ লতে হয়।'' ''গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়।''[২৪]

পাপ-পুণ্য : নানক বলেছেন,

''কাম-ক্রোধ দোই করো
বসোলে গোডহো ধরতী ভাই।
জিও গোডহো তিও তুম সুখ
পাবহো কিরৎ না মেটেয়া যাই॥''

—হে মানব, তুমি কাম আর ক্রোধরূপ শক্তিকে নিড়ানিতে পরিণত করো এবং তার সাহায্যে তুমি তোমার দেহরূপ জমির বিকাররূপী আগাছাগুলিকে ধ্বংস করে জমিকে উর্বরা করে তোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে অনুরূপ স্বর : ''অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়।... অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।''[২৫]

নানক বলেন,

''ভাও ভগতি কর নীচ সদায়ে।
তাও নানক মোখস্তর পায়ে॥''

—যিনি ঈশ্বরের দাসত্ব ও সেবা করে দীন (অহংরহিত) রূপে পরিচিত হন, নানকের মতে তিনি অন্তিমে মোক্ষ লাভ করে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত।... একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস' এইভাবে থাক।''[২৬]

সৃষ্টি, সংসার ও মানুষ : নানকের কথায় :

''জ্যায় সে জল মহে কমল
নিরালঘু মুরগাঈ ন্যায় সানে।
সূরত শব্দ সাগর তরিয়ে
নানক নাম বখানে॥''

—সীমাহীন সরোবরে কমল যেমন অবলীলাক্রমে ভেসে থাকে, পানকৌড়ি যেমন জলের গভীরে ডুব দিয়েও জলস্পর্শ হতে মুক্ত থাকে, তেমনই নামকে আশ্রয় করলে জীব মায়া ও মোহের আকর্ষণ অবলীলাক্রমে জয় করে ভবসাগর লঙ্ঘন করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ,'' ''এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।... আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।''[২৭]

সেবা, ভক্তি ও নম্রতা : গুরু নানক বলেন,

''বিচ দুনিয়া সেব কমাইয়ে।
তা দরগাহ ব্যয়ঠন পাইয়ে॥''

—এই সংসারে জীবের সেবা করে পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তিনি তুষ্ট হলেই তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করার অধিকার অর্জন করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।'' ''সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,—জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্তন।''[২৮]

নানক অন্যত্র বলেছেন, ''অপ গবায়ে সেবা করে তা কছু পায়ে মান।''

—আত্মসুখ বিস্মৃত হয়ে যিনি জীবের সেবার পথ অবলম্বন করেন, তিনিই প্রভুর দরবারে যথোচিত সম্মান লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে বলেন, ''দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।'' তিনি এটি ত্যাগ করার জন্য ভক্তদের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিতেন এবং আরও বলতেন, ''সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন।''[২৯]

গৃহ, বৈরাগ্য ও ত্যাগ : নানক বলেছেন,

''কেয়া জংগল ঢুঁটী যায়ে
ম্যাঁয় ঘর বন হরিয়া বলা।
সচ টিকে ঘর আয়ে শব্দ উতাবলা॥''

—ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য আমি বনে যাব কেন? বনে গেলেই যদি তাঁকে পাওয়া যায় তাহলে আমার গৃহকেই আমি কল্পনা করে নেব সুন্দর সবুজ বনস্থলীরূপে। যার মন সেই সদা স্থির প্রভুর স্মরণে স্থৈর্য লাভ করে, ঈশ্বর তাঁর মনোরূপ গৃহে এসে সতত অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও অনুরূপ অভিমত। বৈরাগ্যের ভান তিনিও পছন্দ করতেন না। বলতেন, ''কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হয় না! বাহিরে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না।''[৩০]

তাঁর এ-নির্দেশ অবশ্য সন্ন্যাসীদের জন্য। গৃহীদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, ''তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।''[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু নানক দর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিখদের সঙ্গ পেয়েছেন, নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাঁদের মুখ থেকে গুরু নানকের জীবনের কথা জেনেছেন। ক্রমে তিনি শিখ ধর্মের মূল চিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করেন এবং এই ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন। ১২৯৭ সালে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থের লেখক রামচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন : ''তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) প্রাণ যারপরনাই উৎসাহিত হইলে তিনি শিখধর্মে দীক্ষিত হইলেন।''[৩২] এ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন অনুকূলচন্দ্র সামন্ত (মণ্ডল) তাঁর গ্রন্থে : ''দ্বারিকাবাবুর পুত্র গুরুদাসবাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম, পরমহংসদেবের বহু শিখ সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিল। তাঁহাদের অনেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিকটে কর্মসূত্রে অবস্থান করিতেন। তাঁহার পরিচিত কোনও শিখ ভক্তের আগ্রহে তিনি একবার (সম্ভবত ১৮৬৯ সালে) বড়বাজারের গুরুদোয়ারায় হাজির হইয়াছিলেন। সেই কালে শিখদের কোনও মহাত্মার আগমন উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে এই যাত্রা ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের উপাসনাবেদীর নিকট হাজির হইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শিখ ধর্মগুরু নানকের সহিত তিনি আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।''[৩৩]

প্রসঙ্গত, বড়বাজারের সেই ঐতিহাসিক গুরুদোয়ারার নাম 'গুরুদোয়ারা সিখ সংগত'। ঠিকানা ১৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ ঘটেছে। এই গুরুদোয়ারার দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে : ''এই পবিত্র স্থানে শ্রীগুরুনানকদেবজী ১৫১০ ইসবীর ২ জানুয়ারি পদার্পণ করেন। ওই সময় এখানে মহামারীর প্রকোপ চলছিল। এই স্থানে উনি সৎসঙ্গ কায়েম করেন এবং উনি এই স্থানে দৈনিক সৎসঙ্গ করার আদেশ দেন। এই স্থানে বারো দিন থাকার পর জগন্নাথ পুরী উদ্দেশ্যে রওনা হন।''

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের অসীম কৌতূহল, অপরিসীম নিষ্ঠা, আন্তরিক অভীপ্সায় শিখ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেই শিখধর্ম সাধনা করেছেন। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে অর্থাৎ যখন তিনি সাধনায় মগ্ন, সেই কালে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে তিনি অপরিচিত। তখনও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। অথচ দক্ষিণেশ্বরের শিখ সেপাইদের মারফত কলকাতার অন্যান্য শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, ''পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উত্তরপার্শ্বে—সরকারী বারুদখানায় মুক্ত তরবারিকরে শিখ প্রহরীগণের ভাগ্যোদয়—লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রভুর বিবিধ সাধন-প্রণালী দর্শনে। ওই শিখ প্রহরীগণের মুখেই প্রভুর প্রথম প্রচার—বড়বাজার মাড়োয়ারী মহলে। ক্রমে প্রভুর আকর্ষণে, মধুকরের ন্যায়... সিদ্ধ, সাধু, সাধক ও সুধিগণের আগমন।''[৩৪] কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার তথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শিখ সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। ✠

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদক : স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ ও ড. পূর্বা সেনগুপ্ত, *শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ৩০৪-০৫

২। ড. গোপাল সিং, অনুবাদক : গুরুনেক সিং, *গুরু নানক* (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট : নয়া দিল্লি, ১৯৬৭), পৃঃ ৪ [এরপর, *গুরু নানক*]
৩। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৯২), পৃঃ ২০ [এরপর, পুঁথি]
৪। *গুরু নানক*, পৃঃ ১২
৫। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ* (ক্যালকাটা বুক হাউস : কলকাতা, ১৪১৫), পৃঃ ৬২
৬। তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বরের মানুষ* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৯), পৃঃ ১২২-২৫
৭। দ্রঃ স্বামী প্রভানন্দ, *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২), পৃঃ ৬৯ [এরপর, *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*]
৮। তদেব
৯। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ২১৩
১০। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, *শ্রীরামকৃষ্ণদেব* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪), পৃঃ ৬৭-৬৮ ১৬৭-৬৮
১১। *পুঁথি*, পৃঃ ২০৮
১২। গুরুদাস বর্মন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত* (কলিকাতা, ১৩১৬), ভাগ ১, পৃঃ ১০৮-০৯
১৩। *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, পৃঃ ৬৭
১৪। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১), *অখণ্ড*, পৃঃ ৬১২ [এরপর, *কথামৃত*]
১৫। *কথামৃত*, পৃঃ ৪৭১
১৬। তদেব, পৃঃ ২৪০
১৭। তদেব, পৃঃ ১৪০
১৮। তদেব, পৃঃ ২৪৪
১৯। তদেব, পৃঃ ১৩৮
২০। তদেব, পৃঃ ৫৪০
২১। তদেব, ২৯৩
২২। তদেব, পৃঃ ৫৪৬-৪৭ এবং ৭৩৫
২৩। তদেব, পৃঃ ৩৭
২৪। তদেব, পৃঃ ৮৩৫ এবং ৫৩৬
২৫। তদেব, পৃঃ ১৩৬
২৬। তদেব, পৃঃ ১২১
২৭। তদেব, পৃঃ ৩৫, ৪৭৫
২৮। তদেব, পৃঃ ৯৫৬, ৬০৫
২৯। তদেব, পৃঃ ৬০৯ এবং ৬৮৬
৩০। তদেব, পৃঃ ৩৪৫
৩১। তদেব, পৃঃ ৭৩৫
৩২। *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ*, পৃঃ ৭০
৩৩। জানবাজার গৃহে পরমহংসদেবের কথা— অনুকূলচন্দ্র সামন্ত (মণ্ডল) (তারা মা প্রেস, বাঁকুড়া, ১৯৫৪), পৃঃ ১৫-১৬
৩৪। *উদ্বোধন*, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃঃ ১২৪ ক

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছে

আমি এই দেশেরই মেয়ে

নিবোধত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং সুধিজন-সমাদৃত রচনাটি ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মবর্ষের প্রাক্কালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হল।
লেখক : মৃদুলকান্তি ধর।
মূল্য : ৩০ টাকা।